CGT : Public policy and Administration in India

4 th Semester (H)

Kamal Sarkar

Unit- IV. b. Redressal of Public Grievances : RTI, Lokpal, Citizens charter and E-Governance

Q : ভারতে জন সাধারণের অভিযোগের প্রতিকারের ক্ষেত্রে RTI, Lokpal, Citizens Charter and E-Governance সম্পর্কে যা জান লেখ।

⟹ অভিযোগের নিষ্পত্তি বিধি মন্ত্রণালয় / বিভাগ কর্তৃক ১৯৬১ সালের বিজনেস বিধি অনুসারে ভারত জনসাধারণের অভিযোগ প্রতিকারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। ভারত সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার ও Public Grievances বিভাগ নিষ্পত্তি ও মীমাংসিত হয়নি অভিযোগ পর্যালোচনা করার জন্য নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাটি যে কোনও প্রশাসনের যন্ত্র যন্ত্রাংশের অংশ ও পার্শ্ব। কোনও প্রশাসন জবাবদিহি, প্রতিক্রিয়াশীল এবং ব্যবহার উপযোগী বলে দাবী করতে পারে না, যদি না এটি একটি দক্ষ ও কার্যকরী অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে। পাবলিক অভিযোগের অধিদপ্তর (ডিপিজি) 1987 সালে পরিচালিত- ভারতবর্ষের জনসাধারণের অভিযোগের প্রতিকারের যন্ত্রপাতি পর্যালোচনার ভিত্তিতে, জন অভিযোগসংক্রান্ত অধিদফতরটি মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ে ০১-০৪-১৯৮৮ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল।

গণতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল শাসক সকল প্রকারের ক্রিয়াকলাপ এবং নীতিমালা সম্পর্কে জবাবদিহি করবে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি / দেশগুলি জনবহুল হওয়ার কারণে এটির প্রয়োজনীয়তা বেশী করে দেখা দিয়েছে। শাসক যাতে তাঁর বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ এড়িয়ে না যায় সেই দিকটি এবং প্রতিফলনটি নিশ্চিত করে। এই মতবাদটি মূল ধারণা থেকে এসেছে যে কোনও ক্ষমতা ব্যবহার বা অপব্যবহারের জন্য শাসক বা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে।

সাধারণত বলা হয় যে কেউই নিখুঁত নয়। সরকারের তথা প্রশাসনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ত্রুটি থাকতে পারে, তবে সেগুলি যদি জনগণের মৌলিক স্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহলে অভিযোগ গুলি সমাধানের জন্য জনগণের বৈধ দাবি রয়েছে।

অভিযোগ নিবারণ হল একটি পরিবর্তনশীল, প্রশাসন-সম্পর্কিত প্রক্রিয়া যা সাধারণত ধীরে প্রবর্তিত হয়। সরকার এবং দুর্নীতি হওয়ার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ভাবেই লোকজনের অভিযোগ থাকবে। কারণ একটি পরিচ্ছন্ন ও দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব। বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা কল্যাণ মূলক; তবে প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত হলে কল্যাণ ও রূপ সৃষ্টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং বলা যায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ থাকবেই এবং সেগুলি অবশ্যই সমাধান করা উচিত।

Reference + Suggested Readings :-

1. Indian Adminimnstration
   Dr. A. Avasthi and A.P. Avasthi
2. E. Governance In India : A Reality
   Vasu Deva.
3. E- Governance : The New Age Governance
   Pankaj Sharma.
4. জনপ্রশাসন ও পরিবেশ
   মোহিত ভট্টাচার্য ও বিশ্বনাথ ঘোষ
5. — জনপ্রশাসন
   রাজশ্রী বসু.
6. Right to Information in India
   S. Singh and P. Sharma

২.৬ তথ্যের অধিকার

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার গুরুত্ব প্রসঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। স্বচ্ছতার সঙ্গে তথ্যের অধিকারের প্রগতি যুক্ত। সাম্প্রতিককালে নাগরিকদের তথ্যের অধিকার ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে। নাগরিক আজ কেবলমাত্র কিছু পরিষেবার উপভোক্তা নয়; সে সরকারের কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রকও, আর সেই হিসাবে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তার জন্য চাই তথ্য। জনপ্রশাসন যথাযথভাবে স্বচ্ছ না হলে কিন্তু আশানুরূপ তথ্য পাওয়াও সম্ভব হয় না। ফলে, তথ্য পাওয়া অনেকটাই প্রশাসনিক স্বচ্ছতার উপর নির্ভর করে। প্রশাসন যত বেশি স্বচ্ছ হবে, তথ্য দিতে তার তত কম আপত্তি থাকবে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যে দেশে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বেশি থাকে সেখানে দুর্নীতির সম্ভাবনাও বেশি থাকে। লোকচক্ষুর আড়ালে দুর্নীতি বেড়ে ওঠে। আর্থিক দুর্নীতি থেকে শুরু করে স্বজন পোষণ অনেক সহজে ঘটে। স্বচ্ছতা দুর্নীতি রোধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তথ্যের অধিকার স্বচ্ছতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তথ্য জানার অধিকারের মধ্য দিয়ে নাগরিকরা সরকারের নানা নীতি ও কাজকর্ম বিষয়ে খবর সংগ্রহ করতে পারে ও তা প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে বা জনসমক্ষে আনতে পারে।

তবে কোন প্রশাসনই সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারে না। অথবা সব বিষয়ের উপর তথ্য দিতে পারে না। স্বচ্ছতার মধ্যেও কিছু বিষয় থাকে যা মনে করা হয় গোপন রাখা প্রয়োজন। বিষয়গুলির অধিকাংশই নিরাপত্তা সংক্রান্ত। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সেই সব তথ্য লোক সমক্ষে আনা হয় না। তবে বলাবাহুল্য, এই গোপনীয় তথ্যের অংশ যত কম রাখা যায় তত ভাল।

ভারতে ২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইন সংসদে পাস হয়। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক গণকর্তৃত্ব তার সংস্থার কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত, আয়-ব্যয়, কাঠামোগত তথ্য জনসমক্ষে রাখতে বাধ্য থাকে। এই আইন মোতাবেক যে

কোন তথ্য যা সংসদে পেশ করা যায় তা থেকে নাগরিকদের বঞ্চিত করা যাবে না। এই আইন বলে কেন্দ্রীয় স্তরে থাকে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন। এই কমিশনের শীর্ষ স্থানে থাকেন প্রধান তথ্য কমিশনার। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে থাকে রাজ্য তথ্য কমিশন যার শীর্ষে থাকেন রাজ্য প্রধান তথ্য কমিশনার। এই তথ্য কমিশনারদের পৌর আদালতের সমান ক্ষমতা থাকে। ২০০৫-এর আইন অনুযায়ী প্রতিটি সরকারী অফিসেই জন তথ্য আধিকারিকের নাম ঘোষিত হতে হয়। কেউ সেই সংস্থা থেকে তথ্য চাইলে তিনি তা সরবরাহ করবেন। এর জন্য যথাযথভাবে একটি ফি সহ দরখাস্ত করতে হয়। তিরিশ দিনের মধ্যে সেই দরখাস্ত হয় নাকচ হয় নতুবা তথ্য দিতে হয়।

তবে তথ্য পাওয়ার উপর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, দেশের নিরাপত্তা, জাতীয় সংহতি ও সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত তথ্য, ব্যক্তির নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য, বিদেশ নীতির ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য বিষয়ক গোপনীয় তথ্য, প্রভৃতি তথ্যের দাবী অগ্রাহ্য হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পৌর সমাজ ও গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো দুর্বল হওয়ায় প্রায়শই স্বচ্ছতার অভাব দেখা দেয়। অতীতের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্যও তার অন্যতম কারণ। দেখা যায়, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার চারপাশে গোপনীয়তার এক বৃত্ত গড়ে তোলে। তথ্য সরবরাহ করার ব্যাপারে আমলাদের মধ্যে অনেক সময়ই তীব্র অনীহা দেখা যায়। তথ্যের দাবীকে তারা নিজেদের অবস্থানের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখে, এক ধরনের বিপন্নতা বোধ তাদের গ্রাস করে। অপর দিকে, জনগণের সংগঠিত ভাবে এগিয়ে এসে তথ্য দাবী করার পরিমণ্ডল এখনও দুর্বল। এই দুর্বলতার মূলে আছে আইনি জ্ঞানের অভাব, আর্থিক কারণ, পৌর সমাজের সার্বিক দুর্বলতা, ব্যাপক দুর্নীতি প্রভৃতি কারণ।

যারা এগিয়ে এসে তথ্য দাবী করে এবং তার ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রভৃতি বিষয়ের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে তৎপরতা প্রদর্শন করে তাদের নিরাপত্তাও অনেক সময়ে বিপন্ন হয়। তাদের নিরাপত্তার জন্য আইনী পদক্ষেপ নেওয়াও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে, ২০১৪-য় Whistleblowers Protection Act সংসদে পাস হয়।

Scanned with CamScanner

৪.৬ স্বচ্ছ শাসন : তথ্যের অধিকার

তথ্যের অধিকারকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও সুশাসনের জন্য আজ অপরিহার্য মনে করা হয়। তথ্যের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনা সম্ভব; আর, কেবলমাত্র প্রশাসনিক স্বচ্ছতা থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

১৯৯৬-এর Chief Secretary-দের সম্মেলনে স্বচ্ছতা ও তথ্যের অধিকারের সপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়েছিল। তারা মনে করে সমস্ত সরকারী দপ্তরে স্বচ্ছতা ও তথ্য পরিবেশনের এক নতুন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তারা এও মনে করে যে সরকারে যত বেশি গোপনীয়তা থাকবে তত বেশি দুর্নীতির সম্ভাবনা থাকবে।

নব্বই-এর দশক থেকে উঠে আসা এই চিন্তা ভাবনা স্পষ্টতই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিকোণ। ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কার্যকলাপের বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখাই ছিল প্রচলিত রেওয়াজ। জনসাধারণ ও প্রচার মাধ্যমকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মূল বাধা ছিল ১৯২৩-এর Official Secrets Act। ১৯২৩-এর আইনটির ফলে সরকারী কর্মচারিদের কোন তথ্য প্রকাশ করাটা ছিল অপরাধ। এই আইনের ফলে সরকারি কর্মচারিরা নাগরিকদের কাছে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য অনেকাংশে গোপন রাখে।

নব্বই-এর দশক থেকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে Official Secrets Act-এর সংশোধন আনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। সেই মত সংশোধন আনা হয়। তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশনামা জারি করে সরকারি বিভাগগুলোর কার্যকলাপের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা আনার প্রচেষ্টা চালায়।

কম্পিউটার নির্ভর National Informatics Centre (NIC) এর মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন আরো সহজ করা হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান সরাসরিভাবে জনসাধারণকে তথ্যের অধিকার না দিলেও মনে করা হয় তা প্রকারান্তরে ১৯নং (১) (ক) ধারায় দেওয়া আছে, যেখানে নাগরিকদের মত প্রকাশের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত।

তথ্যের অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দিতে ২০০৫-এ সংসদ তথ্যের অধিকার আইন বা Right to Information Act (RTI) পাস করে। এই আইনটির পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত, প্রশাসনের প্রায় সবটাই এর আওতায় আসে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন কোনটাই বাদ থাকে না। এই আইনের মাধ্যমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি সফল হবে এমনটাই মনে করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য প্রসঙ্গে তার প্রস্তাবনায় বলা হয়

"...to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commission and for matters connected therewith and incidental thereto."

তথ্যের অধিকার আইনের মূল বক্তব্য হ'ল—

- নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে।
- এই 'তথ্য' বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যথা নথি, ই-মেল, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য প্রভৃতি।
- সাধারণতঃ একজন আবেদনকারী তার আবেদন করার তিরিশ দিনের মধ্যে তথ্য পেতে পারে।
- বিশেষ ক্ষেত্রে (যদি তা জীবন-মরণ বা স্বাধীনতার প্রশ্ন হয়) ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেও তথ্য পাওয়া যায়।
- লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে আবেদন জমা হলে সরকারি আধিকারিক তথ্য দিতে বাধ্য।
- বিশেষ কিছু ধরনের তথ্য দেওয়া অবশ্য নিষিদ্ধ আছে।
- তথ্য চেয়ে কেউ দরখাস্ত করতে চাইলে সে দরখাস্ত না নেওয়া বা যথা সময়ের মধ্যে তথ্য না দেওয়া জরিমানাযোগ্য অপরাধ।
- কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলিকে যথাক্রমে Central Information Commission ও State Information Commission গঠন করতে বলা হয়।

উল্লিখিত ব্যবস্থার ফলে, সরকারি সংস্থায় অনেক বেশি স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা আনা সম্ভব। সে দিক থেকে বিচার করলে মানতেই হয় তথ্যের অধিকার আইন নিঃসন্দেহে সুশাসনের দিকে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৪.৫ সিটিজেন্‌স্‌ চার্টার

নব্বই-এর দশক থেকে যে সুশাসনের ধারণা গুরুত্ব পেয়ে এসেছে, Citizen's Charter-কে তার অপরিহার্য দিক বলে মনে করা হয়। এমন একটা সময়ে যখন জনপ্রশাসনের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল এবং সার্বিকভাবে সরকারের যোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ছিল। Citizen's Charter-কে অনেকটাই সুরাহার পথ হিসাবে দেখা হয়।

Citizen's Charter-এর মূল বৈশিষ্ট্য হল (ক) জনপরিষেবার ক্ষেত্রে কাজের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষিত করা (খ) কর্ম প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে স্বচ্ছতা বজায় রাখা ও তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা, (গ) উপভোক্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা ও তাদের চাহিদা সম্পর্কে জানা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে গুরুত্ব দেওয়া, (ঘ) সমস্ত উপভোক্তাকে সমানভাবে পরিষেবা দেওয়া। আধিকারিকদের নামের ব্যাজ পরা উচিত ও নম্র সহযোগিতার আচরণ করা উচিত; (ঙ) যদি পরিষেবা দানে কোথাও কোন ভুল হয়, দ্রুত ক্ষমা প্রার্থনা করে তা শোধরানো উচিত। অভিযোগ দায়ের করার প্রক্রিয়া, যতটা সম্ভব, সুপ্রচারিত ও সহজ হওয়া দরকার। (চ) জাতীয় সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুযোগ্য পরিষেবা প্রদান করা উচিত এবং নাগরিক গোষ্ঠীর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডের মাপকাঠিতে কাজের স্বাধীন মূল্যায়ন করা উচিত।

সুশাসনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। Citizen's Charter সেই লক্ষ্যেই অগ্রসর হওয়ার পদক্ষেপ। প্রতিদিন প্রশাসনের সাথে তার আদান প্রদানে নাগরিকরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় সেইগুলির মোকাবিলা করতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই Citizen's Charter-এর ধারণাটি আসে। পরিষেবা দাতা ও গ্রহিতার মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপন করা তার লক্ষ্য।

ব্রিটেনে ১৯৯১ সালে প্রথম এই ধারণাটি উঠে আসে ও গৃহীত হয়। এর লক্ষ্য ছিল নাগরিক স্বার্থ মাথায় রেখে ক্রমাগত পরিষেবা উন্নততর করা। মূল উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন ঘটানো।

ব্রিটেনের এই প্রচেষ্টায় পৃথিবীর অনেক দেশেই আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। এর ফলে যে রাষ্ট্রগুলি Citizen's Charter চালু করে তাদের মধ্যে ছিল অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, স্পেন প্রভৃতি। ভারতেও ১৯৯৭-এ Citizen's Charter চালু হয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৪.৭ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন

নব্বই-এর দশক থেকে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে। বৈদ্যুতিক মাধ্যমে, দ্রুত, সহজভাবে, কম ব্যয়ে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। শাসন অনেকটাই ই-শাসনের রূপ নেয়। Manuel Castells তাঁর গ্রন্থ *The Information Age : Economy, Society and Culture* (Book I)[Oxford : Blackwell, 1996]-এ লেখেন :

"As a historical trend, dominant functions and processes in the information age are increasingly organized around networks."

ই-গভর্নেন্স-এর মূল অর্থ হল কম্পিউটারের মাধ্যমে সরকারের তথ্যাদি সংরক্ষণ করা ও online পরিষেবা প্রদান করা। ভারত সরকার এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাসনকে SMART শাসনে রূপান্তরিত করার কথা বলে। এই SMART শাসন হল Simple, Moral, Accountable, Responsive ও Transparent। অর্থাৎ, সহজ, নৈতিক,

দায়বদ্ধ, সংবেদনশীল ও স্বচ্ছ। Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), International network (Internet), মোবাইল ও কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে আশা করা হয় এই উন্নততর পরিষেবা সম্ভব হবে।

উনিশশো আশির দশকে ভারতে সরকারি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার প্রথম চালু হয়। নব্বই-এর দশকে তার ব্যবহার ব্যাপকতর হয়। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ই-গভর্নেন্স-এর বিষয়টি গুরুত্ব পায়। একদিকে যেমন তার চাহিদা উঠে আসে। অপরদিকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় সরকারের আগ্রহও বৃদ্ধি পায়। অগ্রগতি এতই দ্রুত হয় যে দেখা যায় ২০১৪-র মধ্যে এক লক্ষ কোটি সরকারি ই-আদান প্রদান হয়। দু-একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র যেখানে নাগরিকরা online পরিষেবা পান—কেন্দ্রীয় সরকারের নির্মল ভারত অভিযান, পাসপোর্ট সেবা প্রকল্প, চন্ডিগড়ে ই-সম্পর্ক, কর্ণাটকের ভূমি প্রকল্প, মধ্যপ্রদেশের গ্রাম সম্পর্ক। যে দপ্তরগুলির কাজকর্মের ক্ষেত্রে ই-পরিষেবা লব্ধ হয় সেগুলির মধ্যে আছে ভূমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুলিশ, রেল।

ই-পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে নিঃসন্দেহে নাগরিকদের পরিষেবা লাভ করা অনেকটাই সহজ হয়েছে। সরকারি কোন কাজ করতে হলে নাগরিকদের আগের মত লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয় না, জটিল প্রক্রিয়ায় সময় নষ্ট করতে হয় না। কর্মচারীদের আচরণের শিকারও হতে হয় না। যেখানে যেখানে ই-পরিষেবা পাওয়া যায় সেখানে নিঃসন্দেহে শাসন অনেক বেশি স্বচ্ছ, সংবেদনশীল ও দক্ষ। তবে, সমস্যা হল সব প্রত্যন্ত গ্রামে এই পরিষেবা এখনও যথাযথ ভাবে পৌঁছয়নি।

ই-গভর্নেন্স্ নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ও সার্বিক সুশাসনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভারতে এখনও বেশ কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। সেগুলির মধ্যে আছে—সবার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সুযোগ না থাকা, কম্পিউটার সংক্রান্ত জ্ঞান না থাকা, প্রথাগত শিক্ষার অভাব, পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner

7

লোকপাল

Vigilance

জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা কেন জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন না, সে প্রশ্ন বারবার দেখা দিয়েছে। আর এই জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা বাড়াতেই আমাদের দেশে লোকপাল বিলটির অবতারণা। বিলটির মোদ্দা কথা হল, দেশের জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখবে লোকপাল নামক একটি স্বাধীন তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান। অভিযুক্তরা দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধানও দেওয়া যাবে এই প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায়।

সরকারী মহলে ক্ষমতা ও দুনীর্তির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। রাজতন্ত্রে বা সামরিক শাসনে শাসকরা আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে থাকে ; এটা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের জনপ্রতিনিধিদের নামও যখন একের পর এক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে তখন গণতন্ত্রের উচ্চ আদর্শগুলি প্রহসনে পরিণত হয়। জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা কেন জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন না, সে প্রশ্নও বারবার উঠেছে। আর জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা বাড়াতেই আমাদের দেশে লোকপাল বিলটির উত্থাপন। লোকপাল বিলটির মোদ্দা কথা হল যে, দেশের জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ওঠা দুনীর্তির অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখবে লোকপাল নামক একটি স্বাধীন তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান। অভিযুক্তরা দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া যাবে এই প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায়। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই কিন্তু এই বিলটি একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে পড়েছে।

জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিতে লাগাম টানতে একটি তদন্তভিত্তিক বিচারকেন্দ্র গড়ে তোলার ধারণাটি কিন্তু মোটেই নতুন নয়। 1809 সালে ওমবাডসম্যান (Ombudsman) নামক একজন তদন্তকারী আধিকারিকের নিয়োগের প্রথা চালু করা হয়। এই ওমবাডসম্যান নিয়োগের ঘোষিত উদ্দেশ্যই ছিল শাসক ও বিচারকদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি ও অপশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের সত্যাসত্য খতিয়ে দেখা। এই আধিকারিকদের নিয়োগের দায়িত্ব পায় আইনসভা। মোটামুটিভাবে দেশে রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই ওমবডসম্যান নিয়োগ করার রীতি ছিল। ওমবাডসম্যান নিরপেক্ষভাবে তদন্তের কাজ চালিয়ে আইনসভার কাছে রিপোর্ট পেশ করতেন। কখনও দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, আবার কখন কোন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিজেরাই

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

উদ্যোগী হয়ে তদন্তের কাজ শুরু করতেন। শুধু সুইডেনেই নয়, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়েতেও এই ওমবাডসম্যান নিয়োগের প্রথা এখনও বজায় রয়েছে। ওমবাডসম্যান না হলেও খানিকটা সে ধরনের একটি পদ রয়েছে ব্রিটেনে, যার নাম "পার্লামেণ্টারী কমিশনার"। তবে তিনি শুধুমাত্র আইনসভার সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করতে পারেন। ওমবাডসম্যান বা পার্লামেণ্টারী কমিশনারের মতো তদন্তকারী পদাধিকারীরা নিজের অথবা যেকোনও সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে তদন্তকার্য পরিচালনা করতে পারেন। সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর দোষী জনপ্রশাসকদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওমবাডসম্যানদের হাতে। অথচ তিনি ডেনমার্কে ততটা ক্ষমতাশালী নন। সেখানে তিনি শুধু শাস্তির সুপারিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রাখতে পারেন। কিন্তু তা কার্যকর করার ক্ষমতা তাদের নেই। তবে এই ধরনের পদাধিকারীর যে ব্যাপক প্রচার পান সেটাই তাদের শক্তি ও ক্ষমতার প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি শাস্তি পান বা না পান, তাদের নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে যে ধরনের প্রচার হয় তাতে এমনিতেই জনসমক্ষে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। আর এতে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা কিছুটা ধাক্কা খায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে প্রস্তাবিত লোকপাল পদটিকে ওমবাডসম্যানেরই ভারতীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে। যদিও প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী লোকপালের ক্ষমতাও এক্তিয়ার অনেকটাই বেশী।

60-এর দশকের শুরু থেকেই ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও জনপ্রতিনিধিদের সম্বন্ধে নানা রূপ দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে থাকে। সেই সময়কার ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার এই সর্বব্যাপী দুর্নীতি রোধ করতে ওমবাডসম্যানের আদলে 'লোকপাল' পদটি তৈরীর কথা ভাবতে থাকে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনতে গঠিত প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন, 1966 (Administrative Reform Commission) জনস্তর বিশিষ্ট একটি তদন্তকারী প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার সুপারিশ করে। কেন্দ্রীয়স্তরে "লোকপাল" ও রাজ্যস্তরে "লোকায়ুক্ত" নামক দুটি প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ ছিল এই কমিশনের রিপোর্টে। এই সুপারিশ মেনে দেশের 17 টি রাজ্যে লোকায়ুক্ত নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়। জনপ্রতিনিধিদের দুর্নীতি রুখতে এবং জনগণের কাছে দ্রুত অথচ সুলভে ন্যায়বিচার পৌঁছে দিতে এই ধরনের নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের কোন বিকল্প থাকতে পারে না। তাই তড়িঘড়ি লোকপাল বিলটির খসড়াও তৈরি করে ফেলা হয়। প্রস্তাবিত বিলটি চতুর্থ মেয়াদকালে (1986) সংসদে পেশ করা হয়। 1969 সালে লোকসভায় বিলটি পাসও হয়ে যায়। এরপর রাজ্যসভায় অনুমোদনের জন্য বিলটি পাঠানো হয়। কিন্তু এরপরই দেখা দেয় ঘোরতর আপত্তি। রাজ্যসভায় বিলটি পাস হওয়ার আগেই লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ফলে আত্মপ্রকাশের আগেই বিলটির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। পরে অবশ্য ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারীর কথা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

মাথায় রেখে বিলটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। বিলটি আটবার সংসদে আলোচনার জন্য পাঠানো হয়। 2001 সালে বিলটি শেষবারের মত সংসদে আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। কিন্তু প্রতিবারই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের অভাবে আস্থাকাল বিলম্ব হতে থাকে। বর্তমান লোকসভাতেই বিলটি পাশ হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

বিলটির বিষয়বস্তু ঃ ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা গেছে যে জনপ্রতিনিধিদের বিশ্বাসযোগ্যতা কমতে থাকে। একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারী দেখা যায়। তার ফলে সরকার, নির্বাচন এমনকি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর থেকে আস্থা হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় স্তরে জনপ্রতিনিধি ও শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই লোকপাল নামক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ মেনে বিগত কয়েক বছরে লোকপাল বিলের খসড়ায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

লোকপাল গঠন ঃ লোকপাল মূলতঃ তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্তকারী সংস্থা। সংস্থার শীর্ষে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বা বর্তমান বা প্রধান বিচারপতি বা যে কোন সহকারী বিচারপতি থাকতে পারেন। রাজ্য হাইকোর্টের যেকোন দুজন বর্তমান বা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বা সহকারী বিচারপতি, বাকী দুই সদস্যপদে মনোনীত হওয়ার যোগ্য। সংস্থার সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ করতে পারবেন রাষ্ট্রপতি। উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার স্পিকার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী সংসদের যে কক্ষের নেতা সেটি ছাড়া অন্য কক্ষটির নেতা ও সংসদের দুইকক্ষের বিরোধী দলনেতাদের নিয়ে গঠিত কমিটি এই সংস্থার সদস্যদের নাম প্রস্তাব করবেন।

লোকপালের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা

লোকপালের মত সম্মানীয় পদটিকে রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য বেশ কিছু রক্ষাকবচের বন্দোবস্ত রয়েছে প্রস্তাবিত বিলটিতে। যেমন,

(1) লোকপালের নিয়োগ শুধুমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিশেষ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই হতে হবে। শাসকদল বা জোট এক্ষেত্রে একতরফা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

(2) লোকপাল পদে নিযুক্ত হওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীরা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীনে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

(3) প্রমাণিত অসদাচরণ ও অক্ষমতার অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পদাধিকারীদের অপসারণ করা যেতে পারে।

(4) দুর্নীতির তদন্ত চালানোর জন্য লোকপালের একটি নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকবে।

(5) লোকপালের বেতন ও ভাতা ভারতের সঞ্চিত তহবিলের (Consolidated Fund of India) ওপর ধার্য ব্যয় বলে গণ্য হবে।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

লোকপালের এক্তিয়ার ঃ প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয়মন্ত্রীসভার যে কোন সদস্য সংসদসহ কেন্দ্রীয় স্তরে সব রাজনৈতিক পদাধিকারীর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে পারেন লোকপাল। প্রধানমন্ত্রীর কোন আচরণ জাতীয় নিরাপত্তা ও জনস্বার্থের ক্ষতি করছে—এমন অভিযোগ উঠলে, তবেই লোকপাল সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে পারেন।

জনপ্রশাসক (Public Servant) ছাড়া যে কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক পদাধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেনা। তবে একটি কাজ সম্পাদনের দশ বছরের মধ্যে সে সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে তা দায়ের করা যেতে পারে। দশ বছরের বেশী পুরানো কাজের অভিযোগ বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে লোকপাল তদন্তের কাজ শুরু করবেন। লোকপালকে দেওয়ানি আদালতের সমতুল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে প্রস্তাবিত বিলের খসড়ায়। আর সেই ক্ষমতার ভিত্তিতে তিনি কোন ব্যক্তির কাছে হাজিরা দেওয়ার সমন পাঠাতে পারেন। অনুসন্ধানের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ সহ রিপোর্ট পাঠাবেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে। লোকপাল প্রয়োজনে, খানাতল্লাসি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশও জারি করতে পারেন। তবে তাকে প্রতি বছর তার কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে হবে।

প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী লোকপাল শুধু জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগগুলির তদন্ত করতে পারেন। প্রশাসকদের অপকর্মন্যতা বা অপশাসনের ফলে জনগণের মনে অসন্তোষ দানা বাঁধলেও সে সম্পর্কে কোন অভিযোগ খতিয়ে দেখার ক্ষমতা লোকপালকে দেওয়া হয়নি।

গণতন্ত্রে জনসাধারণের সুবিচার পাওয়ার শেষ আশা বিচার বিভাগ। কিন্তু অধস্তন বিভিন্ন আদালত, এমনকি হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যেও বর্তমানে যেভাবে দুর্নীতি বাসা বাঁধছে তাতে সাধারণ মানুষ বিচারবিভাগের উপরও আর সে ভাবে আস্থা রাখতে পারছে না। তাই UPA সরকার বিচারবিভাগকেও লোকপালের আওতায় আনতে আগ্রহী।

বিতর্কের কারণ ঃ জন্মের পর থেকেই একের পর এক বিতর্ক তাড়া করে ফিরছে এই বিলটিকে। বিলে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলিতে নিয়ে এখনও কোন চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌছানো যায়নি। প্রধানমন্ত্রীর পদটিকে লোকপালের বিচার ক্ষমতায় রাখা উচিৎ হবে কি না, তা নিয়ে সবচেয়ে বেশী বিতর্ক। নীতিগতভাবে অন্য সব প্রতিনিধিদের মত প্রধানমন্ত্রীর পদটিও লোকপালের আওতায় থাকা উচিত। কারণ আমাদের সংবিধান আর আইনের অনুশাসনে বলে 'কোন নাগরিকই আইনের উর্ধ্বে নয়, তার পদমর্যাদা যাই হোক না কেন'। এই যুক্তি মেনে অসদাচরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীরও শাস্তি প্রাপ্য। আবার ভিন্নমতাবলম্বীরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির মত সম্মানীয় পদকে সাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের সমগোত্রীয় না করাই উচিত। প্রধানমন্ত্রীর পদকে লোকপাল নামক তদন্তকারী

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আধিকারিকের আওতাভুক্ত রাখলে বিশ্বের কাছে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর পদকে লোকপালের তদন্তের আওতায় রাখার সপক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। এমনকি রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম রাষ্ট্রপতির পদটিকেও লোকপালের এক্তিয়ারভুক্ত করার পক্ষপাতি।

এছাড়াও প্রস্তাবিত বিলটিতে এমন কিছু বিষয় আছে যা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী, যেমন এই বিলে বলা হয়েছে যে, লোকপালের তদন্ত চলাকালীন সময়ে সে সম্বন্ধে সংবাদ মাধ্যমে কোন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।

প্রস্তাবিত বিলে লোকপালের কর্মপদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। খাতায় কলমে লোকপালের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার মহান আদর্শের কথা বার বার বলা হলেও বাস্তব চিত্রটি ঠিক উল্টো। কারণ লোকপালকে তাঁর তদন্ত কাজের জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত তদন্ত সংস্থাগুলির উপর নির্ভর করতে হয়। আর এই সংস্থাগুলির রাজনৈতিক চরিত্র কারও অজানা নেই। সাম্প্রতিককালে সি. বি. আইকে তার পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্য বেশ কয়েকবার সুপ্রীম কোর্টের ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে। এছাড়া লোকপাল কতখানি আর্থিক ক্ষমতা ভোগ করতে পারবেন বা কতটা স্বশাসন পাবে তার উপরও এই পদটির কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তা না হলে এটিও সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বা অন্যান্য তদন্তসংস্থাগুলির মত হয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে রাজ্যস্তরের লোকায়ুক্তর অক্ষমতার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির 1965-এর সুপারিশ মেনে 17 টি রাজ্যে লোকায়ুক্ত নামক তদন্তমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ নেয় ওড়িষ্যার রাজ্য সরকার। 1971 সালে সে রাজ্যে গঠিত হয় লোকায়ুক্ত। তবে লোকায়ুক্তের ক্ষমতার পরিধি সব রাজ্যে সমান নয়। কোন কোন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীসহ সমস্ত জনপ্রতিনিধিকেই লোকায়ুক্তের এক্তিয়ারের মধ্যে রাখা হয়েছে, আবার কর্ণাটকের মত অনেক রাজ্যে আইন সভার সদস্যদের সযত্নে লোকায়ুক্তের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। লোকায়ুক্তের অধীনে কোন নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থা নেই। ফলে প্রতি পদে পদে রাজনৈতিক কর্তা ব্যক্তি ও আমলাদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হন লোকায়ুক্ত পদাধিকারীরা। এই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব হয় না। অথচ এর জন্য রাজ্যের অর্থভাণ্ডার থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা গেছে এই ধরনের পদগুলিকে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে অবসরপাপ্ত বিচারপতিদের পুরস্কৃত করার কাজেই ব্যবহার করা হয়।

লোকপাল বিলের আরও একটি বিষয়কে সমর্থন করা যায় না। এখানে অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হলে অভিযোগকারীকে শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে। জনপ্রতিনিধিরা যাতে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতেই লোকপাল গঠনের উদ্যোগ। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থতার জন্য যদি আর্থিক জরিমানা বা কারাবাসের মত শাস্তির

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

সম্মুখীন হতে হয় তাহলে অভিযোগ দায়ের করতে যে কেউই এগিয়ে আসবে না, তা ধরে নেওয়া যায়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পদাধিকারীদের জনগণের আস্থা ফেরাতে দেশে লোকপালের মত কর্তৃপক্ষের যে প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নটি জাগছে এর কার্যকারিতা নিয়ে। এই বিলটিকে নিয়ে যখন সব রাজনৈতিক দলই নীতিগতভাবে একমত তখন এটিকে নিয়ে কালবিলম্ব কেন করা হচ্ছে সে উত্তরও সবার জানা। দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি রন্ধ্রে যেভাবে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে তাতে সব রাজনৈতিক দলই অস্বস্তিতে রয়েছে। রাজনৈতিক পদাধিকারীদের সদিচ্ছা থাকলেই লোকপাল পদটিকে দায়িত্বশীল ও কার্যকরী করে তোলা যায়। শুধু বিধিবদ্ধ ক্ষমতায় কাজ চলবে না। লোকপালের হাতে শাস্তির নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা দিতে হবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner